মো. আরিফুল ইসলাম

শিশু নির্যাতন বাড়ছে কেন

দেশে শিশু হত্যা, যৌন ও শারীরিক নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু গৃহকর্মীকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাসায় আটকে রেখে গুরুতর জখম বা যৌন নির্যাতন করার মতো ঘটনাও মাঝে মাঝে গণমাধ্যমে এসেছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের (বিএসএএফ) বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর বাংলাদেশে ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে শিশুহত্যা বেড়েছে ২৮ শতাংশ এবং শিশু ধর্ষণ বেড়েছে ৩৩ শতাংশ। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৩০.৮ শতাংশ শিশু (০-১৪ বছর)। শিশুরা কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বা তারা অনেকটাই যৌন আবেদনহীন; তাই শিশু খুন বা ধর্ষণের হার শূন্যের কাছাকাছি হওয়ার কথা। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী, ২০১৪ সালে বাংলাদেশে মোট ধর্ষিতার ২৯.৬৭ শতাংশ ছিল শিশু। বিএসএএফ ও পুলিশ সদর দফতরের তথ্যানুসারে, ২০১৮ সালে প্রথম ছয় মাসে ৩৫১ জন শিশু ধর্ষণ এবং ২১৬ জন হত্যার শিকার হয়েছে, যা মোট হত্যার ১১.১৯ শতাংশ। শিশুর প্রতি ব্যতিক্রমধর্মী সহিংস ঘটনা সংখ্যায় কম হলেও তার বহিঃপ্রকাশ মানুষের মনকে নাড়া ও অপরাধ-ভীতি তৈরি করে; যার ফলে শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন থাকতে হয় এবং এটি একটি দেশের মানুষের জীবনমানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই লেখাটিতে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতা বৃদ্ধির কারণগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পারিবারিকভাবে শিশুর প্রতি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, পরীক্ষা ও ফলাফলকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের অধিক গুরুত্ব প্রদান। অর্জনকেন্দ্রিক এ প্রবণতা শহরাঞ্চলে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা তাদের শৈশবকে একটি তিক্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত করছে।

বিভিন্ন ধরনের অনুশাসনের (যেমন পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ইত্যাদি) চর্চা থেকেও কিছু শিশু সহিংসতার শিকার হচ্ছে। সন্তানের ওপর অভিভাবকের অধিকার চর্চা করতে গিয়ে অনেক সময় মা-বাবা শিশুদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং শারীরিক নির্যাতন করছেন। অভিভাবকের এরূপ আচরণের কারণে অনেক শিশু আত্মহত্যা পর্যন্ত করছে। অনেক সময় কোমলমতি শিশুদের একাকী স্কুল ও কোচিং সেন্টারে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এছাড়াও অভিভাবকরা বিশ্বাস করে শিশুদের শিক্ষকের বাসায় পড়তে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু বাড়িতে বা অন্য কোনো স্থানে মেয়ে শিশুর একাকী অবস্থান তাকে অনিরাপদ করে তুলছে। সামাজিক অনুশাসন বিচ্যুত কিছু মানুষ নির্জন পরিবেশে স্কুল, কোচিং সেন্টার, যানবাহনসহ অন্যান্য স্থানে ধর্ষণ করছে। কখনও কখনও শিশুরা নিজ বাড়িতেও গৃহশিক্ষক কর্তৃক যৌন নির্যাতনের ঝুঁকিতে থাকে। এছাড়া মাদ্রাসাভিত্তিক এতিমখানার অসহায় বাচ্চাদের ওপর অনেক সময় শিক্ষকরা লেখাপড়ার জন্য নিষ্ঠুর আচরণ করছেন, যাদেরকে একাডেমিক স্লেভও বলা হয়।

স্বামী-স্ত্রীর কলহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের (প্রতি হাজারে বিচ্ছেদের হার ১.১ জন) সঙ্গেও শিশু নির্যাতনের সম্পর্ক রয়েছে। সৎবাবা কর্তৃক কখনও কখনও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের ঘটনাও সংবাদ হচ্ছে। কর্মস্থল দূরে থাকার কারণে বাবার অনুপস্থিতিতে মা কর্তৃক শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হচ্ছে। কিছু নারী ও পুরুষ পরিবারের প্রতি অনুগত ও একনিষ্ঠ থাকছে না। বিশেষ করে, প্রবাসীর স্ত্রী'রা কখনও কখনও অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে নিজের সন্তানকেও হত্যা করে ফেলছেন। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে বা যথাযথ সামাজিকীকরণের অভাবে পরকীয়ার বলি হচ্ছে শিশুরাও।

শহরের নিম্নআয়ের বিশেষত বস্তির মানুষ একই কক্ষে পরিবারের অনেককে নিয়ে বসবাস করায় নিজ স্ত্রীর সঙ্গে জৈবিক চাহিদা মেটানোর সুযোগ কম পাচ্ছেন। ফলে এ শ্রেণীর মানুষরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শিশু ধর্ষণেও দ্বিধা করছে না। বর্তমানে বিয়ের প্রবণতা কমে গিয়ে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড নামক নতুন পশ্চিমা সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে বিয়ের আগে অনেকেই অনিরাপদ যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে ভ্রূণ ও নবজাতক হত্যা করছে। মোটিভেটেড ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা ঘটনাকালীন অনেকটাই অবচেতন মনে থাকে, যেখানে সে তার দ্বারা সংঘটিত কার্যটির ভয়াবহতা ও ভবিষ্যৎ ফলাফল অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া পর্নোগ্রাফি দেখেও যুবসমাজ বিচ্যুত হচ্ছে। কিছু মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে বহুগামিতা বা শিশুর প্রতি যৌন উত্তেজনা অনুভব করার বিষয় থাকলেও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধের অভাবে নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছে।

মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্মস্থলে বা বাইরে থাকার কারণে শিশুরা প্রতিবেশী দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নিম্নআয়ের মানুষ বিশেষত গার্মেন্টস কর্মীদের বাচ্চারা বাসায় একাকী বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। অনেক সময় বাচ্চার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অনেক বাবা-মা শিশুকে শ্রমে নিয়োগ করছে। প্রতিবেশীদের মধ্যে শত্রুতার জের ধরেও শিশুরা নির্মমতার শিকার হচ্ছে। আবার প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে গিয়ে নিজের শিশু সন্তানকে হত্যা করার মতো ঘটনাও ঘটছে। মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটনাও ঘটছে, যা সমাজে কাঙ্ক্ষিত নয় এবং প্রচলিত মূল্যবোধের পরিপন্থী।

শিশুদের শারীরিক শক্তি কম এবং প্রতিরোধে যথেষ্ট সক্ষম না থাকায় অপরাধীরা তাদের উপযুক্ত টার্গেট হিসেবে বেছে নিচ্ছে। বিআইএসআরের এক গবেষণা (২০১৩) মতে, যেখানে অপরাধী এ ধরনের অপরাধ করার ক্ষেত্রে ভিকটিম দ্বারা চ্যালেঞ্জ বা প্রত্যাখ্যান, প্রতিরোধ এবং পরবর্তী সময়ে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখে, সেখানে এ ধরনের অপরাধ করে থাকে। শিশুরা বুদ্ধিতে অপরিণত থাকায়, অনেক সময় নির্যাতনকারীর সামনেই ঘটনাটি জানিয়ে দেয়ার কথা বলে। ফলে শিশুরা ধর্ষণ বা বলাৎকারের ঘটনাটি বলে দিতে পারে— এই সন্দেহ বা প্রমাণ লুকানোর জন্য নির্যাতনকারী শিশুটিকে হত্যাই করে ফেলে। তাছাড়া মা-বাবার ধর্মীয় কুসংস্কার ও কোনো ব্যক্তির প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকার দরুন শিশুটির অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারবার নির্যাতনকারীর কাছে যেতে হচ্ছে।

দরিদ্র শ্রেণীর অবহেলিত ও পথশিশুর সংখ্যা অনেক। অভিভাবকরা তাদের শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজে দিতে বাধ্য হচ্ছে এবং পরবর্তী সময়ে নিয়োগকারীরা এদের অনেককে নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন করছে। শহরাঞ্চলে পাশাপাশি ফ্ল্যাটগুলো থাকে অনেকটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং সীমিত প্রবেশাধিকারসম্পন্ন। তাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোনো শিশু গৃহকর্মী নির্যাতিত হতে থাকলেও হস্তক্ষেপ করার কেউ থাকে না।

শিশুদের ছোটখাটো অপরাধের কারণে সালিশি বিচারের নামে তাদের সঙ্গে সহিংস আচরণ করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে একাধিক অপরাধের ভুক্তভোগী জনতার ক্ষোভ কোনো একটি শিশুচোর বা পকেটমারের ওপর পড়ছে। সাধারণ মানুষ এরূপ কোনো সহিংস ঘটনা ঘটতে দেখলেও হস্তক্ষেপ না করে ঝামেলামুক্ত থাকতে চায়। অপরদিকে বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা, দোষীদের দ্রুত জামিন, সাজার হার কম ইত্যাদি ঘটনায় মানুষের মনে সহিংস কাজের প্রতি ভীতি কাজ করছে না।

আপাতদৃষ্টিতে ইন্টারনেটের কল্যাণে প্রচারণা বাড়ছে মনে হলেও তা বাস্তবে সচেতনতা বৃদ্ধিতে খুব একটা প্রভাব ফেলেনি। একই ধরনের সহিংস ঘটনা পুনরাবৃত্তির একটি কারণ হচ্ছে প্রচারণাগুলো সম্ভাব্য অপরাধী বা ঝুঁকিপূর্ণ ভিকটিম কারও কাছেই ঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে না। অর্থাৎ যারা অপরাধ করছে বা শিকার (শিশুরা) হচ্ছে, পত্রিকা বা অনলাইনে সংবাদগুলো পড়ে তাদের ঘটনাগুলো জানা ও সচেতন হওয়ার সুযোগ কম থাকছে।

শিশুর প্রতি সহিংসতা কমানোর জন্য যা করা দরকার— ১. নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কখনও শিশুদের একাকী না রাখা; ২. স্বামী-স্ত্রী উভয়ই কর্মজীবী হলে শিশু সন্তানকে দিবাযত্ন কেন্দ্রে বা বিকল্প ব্যবস্থায় রাখা; ৩. গৃহকর্মীকে নিয়মিতভাবে সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার মাসিক পরিদর্শনে রাখা; ৪. সম্ভাব্য অপরাধী ও ঝুঁকিপূর্ণ ভিকটিমকেন্দ্রিক প্রচারণা চালানো; ৫. জনসাধারণকে অপরাধ প্রতিরোধে দায়িত্বশীল ও সমাজ স্বীকৃত উপায়ে যৌন চাহিদা মেটানো; এবং ৬. অপরাধীর দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি।

মো. আরিফুল ইসলাম : *গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট*